ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি
(The Psychological Basis of the Origin and Development of Religion)

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ধর্মের উৎসের সন্ধান করব মানুষের মনের গভীরতায়। মানুষের মনের গঠনের মধ্যেই এমন কোন প্রবণতা আছে কি যা তাকে আধ্যাত্মিক পথের দিকে আকৃষ্ট করে? মনোবিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

৩.১ সহজাত ধর্মীয় প্রবৃত্তি (Religious Instinct)

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বলেন যে মানুষের ধর্মপ্রবণতা হল এক সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct)। এই মতটি একসময় জনপ্রিয় হয়েছিল কিন্তু একে যথার্থরূপে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলা যায় না। মানুষের একেক রকম আচরণের জন্য একেকটি সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব ধরে নিলে কাজ সহজ হয়, কিন্তু তাতে কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। মানুষসহ অন্যান্য জীবের সহজাত প্রবৃত্তির তত্ত্বের পথিকৃৎ McDougall-এর মতে ধর্মকে সহজাত ধর্মীয় প্রবৃত্তি থেকে উৎপন্ন বলা যায় না। একথা ঠিক যে মানুষের ব্যক্তিত্ব, আচার-আচরণের মূলে থাকে কতকগুলি আদি উপাদান যাকে সহজ প্রবৃত্তি বলা হয়। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি অত্যন্ত সহজ সরল এবং সংখ্যায় অতি অল্প। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে সহজ প্রবৃত্তি হল কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বা কোন একজাতীয় বস্তুর প্রতি বিশেষ একধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্মগত প্রবণতা। এই প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্য কোন পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। বলা যেতে পারে তা এক ধরনের 'অশিক্ষিত পটুত্ব'।

কিন্তু মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও আচরণ বিভিন্ন মৌল প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন এক জটিল মানসিকতা তার প্রকাশও ঘটে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় আচরণের মধ্যে দিয়ে। ধর্ম কখনই বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ধরনের আচরণ নয়।

M. Jastrow যখন বলেন যে ধর্মীয় প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তখন সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবু তাঁর বক্তব্যে একটি মূল্যবান সত্য নিহিত আছে যে ধর্ম সহজাত প্রবৃত্তির মতই স্বতঃস্ফূর্ত, অপ্রতিরোধ্য, স্থির লক্ষ্যাভিমুখী ও প্রায় সার্বজনিক। ধর্মের উৎপত্তি মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে। মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরস্পরের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে এক মূল লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে ওঠে তারই প্রকাশ ঘটে ধর্মরূপে।

Scanned by CamScanner

৩.২ ধর্ম-উৎপাদক মানসিক বৃত্তি (Religious Faculty)

মানুষের মনে একটি ধর্মোৎপাদক বৃত্তি আছে যার থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে—এই তত্ত্বও সন্তোষজনক নয়। মানুষের মনের এক এক জাতীয় কাজ একেকটি মানসিক বৃত্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়—এই তত্ত্ব এখন মনস্তাত্ত্বিকদের দ্বারা বর্জিত হয়েছে। মনকে এইভাবে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠে ভাগ করে মানস ক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। মন সামগ্রিকভাবে কাজ করে। সুতরাং, বিশেষ কোন মানসিক বৃত্তি তার ধর্মীয় জীবনের সমস্ত চিন্তাভাবনা আচার-আচরণের কারণ, এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অচল।

৩.৩ জীবন তৃষ্ণা (Will to live)

মানুষের মনের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট প্রবৃত্তি, আবেগ বা অন্য কোন মানসিক উপাদান নেই যা কেবলমাত্র তার ধর্মীয় আবেগ, আচার-আচরণের কারণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। যদি কেউ বলেন পার্থিব জীবনের নানা ভয়, আশঙ্কা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল তাহলে বলা যেতে পারে যে ভয় ও ধর্মীয় আবেগ এক নয়। নানা কারণে ভয় সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় আবেগে কি একমাত্র ভয়ই থাকে?

Edwards মনে করেন মানবচেতনার ঊষালগ্নে মানুষ অনুভব করেছিল যে নানা রহস্যময় শক্তির দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত। এই চেতনা থেকেই তার মনে ধর্মের উৎপত্তি হয়। সে সেইসব রহস্যময় শক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল মানার ধারণা। আদিম মানুষ মনে করত মানার মধ্যে রয়েছে সেই যাদুকরী শক্তি যা তার জীবনযুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো সহায়। তাহলে বলা যেতে পারে যে, ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল মানুষের দুর্নিবার বেঁচে থাকার ইচ্ছে থেকে। কথাটা সদর্থক ও নঞর্থক দুদিক থেকে সত্য। চারদিকে জীবনধারণের প্রতিকূল বিভিন্ন অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং সদর্থকভাবে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার স্পৃহা তার ছিল। আদিম মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা ছিল প্রচণ্ড সংগ্রামের ব্যাপার—হিংস্র জীবজন্তু, সরীসৃপ ইত্যাদির দ্বারা জীবন পরিবৃত ছিল, ছিল প্রাকৃতিক দৈব দুর্বিপাক, খাদ্য-আশ্রয়-নারী ইত্যাদির জন্য রেষারেষি, গোষ্ঠী সংঘর্ষ। কাজেই যদি কোন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবন নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিন্ত করা যায় সেই শক্তির অন্বেষণ ছিল তাদের প্রধান ভাবনা—একথা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগে সে নিজের চারপাশে নানা রহস্যময় শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করত। তাদের কাছে সে প্রার্থনা জানাত, তাদের সন্তুষ্টি বিধানের সবরকম চেষ্টা করত।

Scanned by CamScanner

সুতরাং Edward মনে করেন, ধর্মের উৎস মানুষের জৈব প্রকৃতির মধ্যে, তার তীব্র জীবনতৃষ্ণা থেকে। সেই আদিম যুগে মানুষের একমাত্র চেষ্টা ছিল টিকে থাকার, জীবনকে প্রবহমান রাখার। এরপর ধীরে ধীরে চেতনার প্রসার ঘটল, তারা চাইল আর একটু ভালভাবে বেঁচে থাকতে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্যমণ্ডিত জীবনযাপন করতে। কিন্তু মানবচেতনা যত বিকশিত হয়েছে ততই সে অন্যান্য জীবের থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন প্রকারের জীবন চেয়েছে। পশুপাখির, কীটপতঙ্গের মতো শুধুই বেঁচে থাকা তার মনের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করতে পারেনি। সেই আকাঙ্ক্ষাই তাকে ধর্মের পথে আকৃষ্ট করেছে। ধর্মের পথে সে খুঁজেছে জীবনের অর্থ। সে অনুভব করেছে জীবন শুধু জৈবিক সুখভোগের জন্য নয়। ত্যাগের দ্বারা, উদারতার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা সে চেয়েছে জীবনকে সৌন্দর্যে সুষমায় মণ্ডিত করে তুলতে। ধর্মই তাকে দিয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, ঐহিকের সঙ্গে পারত্রিকের, পার্থিব তুচ্ছতার সঙ্গে মহান পরিত্রাতার সংযোগ সূত্রের সন্ধান।

কেউ কেউ আপত্তি করেন যে, প্রাচীনতম মানুষের ধর্মে আধ্যাত্মিক সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সাধনার ধারণা কি আরোপিত নয়? সেই যুগের ধর্মের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে কেবলই আবেদন-নিবেদন, আকুতি-মিনতি, কেবলই দাও দাও—ধন দাও, ঐশ্বর্য দাও, যুদ্ধে জয়ী কর, শত্রু নাশ কর, রোগ নির্মূল কর ইত্যাদি।

এর উত্তরে বলা যায় সেই যুগে মানুষের জীবন এত অনিশ্চিত ছিল, জীবনসংগ্রাম এত কঠিন ছিল যে আত্মরক্ষার চিন্তাই তাদের গ্রাস করে রেখেছিল। যতই জীবনের নানা বিঘ্ন দূর হয়ে জীবনের উদ্বেগ কমেছে, ততই ধর্ম তাদের নিছক জৈব অস্তিত্বের চিন্তার ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শের সন্ধান এনে দিয়েছে।

এই পরমার্থতাই তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য একথা মানুষের চেতনায় ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়েছে। তারই জন্য মানুষ অতিমানবিক (Super human) অথচ ব্যক্তিসুলভ (Personal) এক শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে। এই শক্তিই হল দেবতা বা ঈশ্বর। দেবতার উপর নির্ভরতার জন্যই ধর্ম মানুষের অন্যান্য আচরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ব্যক্তিসুলভ এই আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষের শুভ ও অশুভের ব্যাপারে উদাসীন নয়। তার সাহায্যেই মানুষ পরমার্থ লাভ করতে পারে। ধর্মের আদিতে মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ঈশ্বরের সাহায্য চেয়েছে, কিন্তু ধর্মচেতনা যত উন্নত হয়েছে মানুষের প্রার্থনার বিষয়ও ভিন্ন হয়েছে। ধার্মিক ধর্মাচরণ করে অন্য কিছুর জন্য নয়, ঈশ্বরকে পাবার, তাঁর দর্শন পাবার ব্যাকুলতায়। ধর্মাচরণের দ্বারা মানুষ তার আরাধ্য শক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। সুতরাং, ধর্মই হল সেই উপায় যার

Scanned by CamScanner

দ্বারা মানুষের জীবন অতিপ্রাকৃত শক্তির অসীম ক্ষমতাবলে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এখানে একটি ব্যাপার উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই আদিম যুগ থেকেই ধর্ম কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। মানুষ বরাবরই সমাজ বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাই মানুষের জীবন একাধারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক। আদিমতম যুগ থেকেই মানুষের ধর্মাচরণের মূলে ছিল গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠীর জীবনের সুরক্ষা। কারণ গোষ্ঠীর সুরক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির জীবনও সুরক্ষিত থাকে এই উপলব্ধি প্রাচীন যুগের মানুষের মধ্যেও ছিল। ব্যক্তিজীবন তখনই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন সে সমাজ জীবনকে প্রবহমান রাখতে সফল হয়। Paulsen বলেছেন, "Every self-sacrifice is at the same time self-preservation, namely preservation of the ideal self"*। আত্মত্যাগ আত্মরক্ষার সহায়ক। ধর্ম মানুষকে আত্মপরতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়, সমাজের বা গোষ্ঠীর স্বার্থে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিতে অনুপ্রাণিত করে। তাই Edwards বলেন ধর্ম গোড়া থেকেই সামাজিক ব্যাপার। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সামাজিক ও ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের মূল লক্ষ্য একই—জীবনের পরিপূর্ণতা।

Scanned by CamScanner